হাইয়া আলাস সালাহ

শাইখ আবু আব্দিল আযিয মুনির আল-জাযায়িরি

সমকালীন প্রকাশন

সূচিপত্র

অবতরণিকা	১৭
সালাতের শীতল পরশে	২৩
সালাতেই স্বস্তি	২৬
সালাত আল্লাহর শুকরিয়া	৩১
শেষ গোসলের সময়	৪৩
অজু : হৃদয়-আত্মার পবিত্রতা	৪৯
সবচেয়ে প্রিয় যে আমল	৫৬
নবিজির চোখে আমরা	৬১
অনুভব করুন সালাতের গুরুত্ব	৬৭
কেন আপনি সালাত পড়ছেন না?	৭২
হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ	৭৯
অপরাধের শাস্তি জাহান্নাম	৮৬
কীভাবে পড়বেন সালাত?	৯১
সত্য ও সৎকর্মের আহ্বান	৯৮

অবতরণিকা

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ... ﴿١٧﴾

হে পুত্র, সালাত কায়েম করো![১]

উপদেশটি লুকমান হাকিমের। প্রিয় সন্তানের প্রতি প্রজ্ঞাবান পিতার দরদি উপদেশ, হৃদয় নিংড়ানো কথামালা।

লুকমান হাকিমের হৃদয় ছিল ভালোবাসা ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ, জবান ছিল মিষ্টতায় ভরপুর। তার মুখনিঃসৃত প্রতিটি কথায় ছিল নিবিড় মমতা ও সুতীব্র আকর্ষণ। আল্লাহ তাঁর এই উপদেশ এতটাই পছন্দ করেছেন যে, তা বিশ্ববাসীর কাছে অমর করেছেন পবিত্র কুরআনে উল্লেখের মাধ্যমে। এই উপদেশবাণী সকল পিতার জন্য উত্তম আদর্শ ও পথপ্রদর্শক।

আপনি হয়তো ভাবছেন আপনার সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হতে এখনো অনেক সময় বাকি। তাদের ওপর তো সালাত ফরয হয়নি। তাই এত চিন্তার কিছুই নেই।

কিন্তু জেনে রাখুন, সালাত অত্যন্ত গুরুত্ববাহী একটি ইবাদত। আপনার সন্তানের জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা নির্ধারণের এখনই উপযুক্ত সময়। সে হয়তো আজকের

---

[১] সুরা লুকমান, আয়াত : ১৭

শিশু; কিন্তু আগামী পৃথিবীর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। যতদিন সে বেঁচে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত যেন সালাত হয় তার নিত্যসঙ্গী। আর সেই চেষ্টাটা আপনাকে এখন থেকেই করতে হবে।

আপনি নিশ্চয় আপনার সন্তানের কল্যাণকামী একজন আদর্শ পিতা। একজন দায়িত্বশীল অভিভাবক। নিজ সন্তানকে সালাতের ওপর গড়ে তুলতে কখনো অবহেলা করবেন না। প্রতিটি বাবা-মায়ের জন্য এ এক বিশাল দায়িত্ব। সুমহান আল্লাহ বলেন—

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا...﴿١٣٢﴾

আপনার পরিবারকে সালাতের আদেশ দিন এবং তাতে অবিচল থাকুন।[১]

তাই মা-বাবাকে নিজ নিজ সন্তানের সফলতার জন্য অগ্রসর হতে হবে, সন্তানের আখিরাতের জন্য হতে হবে মঙ্গলকামী ও যত্নবান।

সন্তানের শুভাকাঙ্ক্ষী হবার ও ভবিষ্যৎ গড়ার প্রথম পদক্ষেপ হলো, সালাতের ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া। প্রতিদিন পাঁচবার মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ থেকে যে আহ্বান ভেসে আসছে—'এসো সালাতের দিকে, এসো সাফল্যের দিকে'—এই বাণীর সাথে সন্তানকে পরিচিত করে তোলা।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সন্তানের বয়স যখন সাত বছর, তোমরা তাদেরকে সালাতের আদেশ দাও। আর তাদের বয়স যখন দশ বছর, তখন (প্রয়োজনে) তাদেরকে সালাতের জন্য প্রহার করো।'[২]

সম্মানিত বাবা, মমতাময়ী মা, আপনার সন্তানকে বারবার উপদেশ দিতে গিয়ে, তাকে প্রতিদিন সালাতের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে আপনি হয়তো ক্লান্ত হয়ে যান। তার কর্কশ আচরণ ও বক্রতায় মনঃক্ষুণ্ণ হন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, তাকে সালাতে অভ্যস্ত করতে পারলে, দ্বীনের ওপর গড়ে তুলতে পারলে যে মানসিক প্রশান্তি ও তৃপ্তি আপনি পাবেন, পৃথিবীর কোনো আনন্দের সাথেই সে আনন্দের তুলনা হবে না।

---

[১] সুরা ত-হা, আয়াত : ১৩২

[২] *আবু দাউদ* : ৪৯৫; *সহিহুল জামি* : ৫৮৬৮

আপনি তাকে লালন-পালন করছেন পরম মমতায়। এমন উত্তম চরিত্র ও উন্নত মানবিকতায় গড়ে তুলছেন যে, মৃত্যুর পরও সে আপনার সৌভাগ্যের কারণ হবে। সাদাকা জারিয়াহ (চলমান সওয়াব) হিসেবে এই সন্তানই আপনার মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে কাজে আসবে। আপনার জন্য তারা দুআ করবে মহান রবের কাছে—

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

হে আমার প্রতিপালক, তাদের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছেন।[১]

পক্ষান্তরে আপনি যদি তাদেরকে মৌলিক দ্বীন শিক্ষা না দেন, তাদেরকে উপযুক্তভাবে গড়ে না তোলেন, দ্বীন শিক্ষাদানে অবহেলা করেন, ফেলে রাখেন অভিভাবকহীনভাবে, তবে জেনে রাখুন, আপনি তাদের সাথে মস্ত বড় অন্যায় করলেন!

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সন্তানের বখে যাওয়া এবং চরিত্র নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ তাদের বাবা-মা। শৈশবে বাবা-মা তাদের প্রয়োজনকে অবহেলা করেছেন। তাদেরকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাদান করেননি, ফরয পরিমাণ দ্বীনি জ্ঞান, সুন্নাতের জ্ঞান তাদের শেখাননি। এভাবে শিশু বয়সে মা-বাবাই তাদের জীবন নষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে তারা নিজেদের কোনো উপকারে তো আসেইনি; উল্টো মা-বাবার মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এক ব্যক্তি তার প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, 'তুমি আমার অবাধ্য হলে কেন? তুমি আমার কথা মেনে চলছ না কেন?'

সন্তান জবাব দিল, 'বাবা, আমার শৈশবে তুমি আমার সাথে অবাধ্যের মতো আচরণ করেছ, তাই বড় হয়ে আমি তোমার অবাধ্য হয়েছি। ছোটোবেলায় তুমি আমার জীবন পণ্ড করে দিয়েছ, তাই তোমার বার্ধক্যে আমি তোমার জীবন পণ্ড করছি।'[২]

---

[১] সুরা ইসরা, আয়াত : ২৪

[২] *তুহফাতুল মাওদুদ ফি আহকামিল মাওলুদ*, ইবনুল কাইয়িম, পৃষ্ঠা : ২৩০

সন্তানকে সালাতের ওপরে দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলা এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাকে সালাতে অভ্যস্ত করে তোলা নবিগণের অনন্য বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা বলছেন—

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

এই কিতাবে ইসমাইলের কথা বর্ণনা করুন, যিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী; একজন নবি ও রাসুল; তিনি তার পরিবারকে সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন। তিনি তার পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন।[১]

সন্তানের লালন-পালন এবং তাদের দ্বীনশিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা হচ্ছে—আল্লাহর কাছে তাদের আলোকিত জীবনের জন্য দুআ করা। অনুনয়-বিনয় করে, কান্নাজড়িত কণ্ঠে, চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে, হৃদয়ের সবটুকু আবেগ, আশা-ভরসা ও বিশ্বাস ঢেলে মহান মালিকের নিকট প্রার্থনা করা। আসমান, জমিন ও আরশের অধিপতির নিকট অসহায়ের মতো, কাঙালের মতো, নাছোড়বান্দার মতো সন্তানের জন্য দুআ করা।

আল্লাহর নবি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এভাবেই ভবিষ্যৎ-বংশধরের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন।

একজন সৎ, আদর্শ ও স্নেহময়ী মা তার ছেলের ব্যাপারে বলেছিলেন—

আমার আদরের ছেলে। আল্লাহ তাকে হিদায়াতের ওপর অটল-অবিচল রাখুন। সে বখে গিয়েছিল। সালাত আদায় করত না। দ্বীনের কোনো বিষয়ের প্রতি সামান্য গুরুত্বও দিত না। সারাদিন আড্ডা-মাস্তি এবং অহেতুক খেল-তামাশায় মজে থাকত। আমি যখন তাকে সালাতের ব্যাপারে তাগিদ দিতাম বা ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতাম, সে আমার কথায় কান দিত না। ওর জন্য কষ্টে আমার ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে যেত। খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। আমার কলিজার টুকরো সন্তান। সালাতের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলার কারণে নিশ্চিত জাহান্নামি হয়ে যাচ্ছে—এই কথা ভেবে আঁতকে উঠতাম। অঝোরে কাঁদতাম আমি।

---

[১] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৫৪-৫৫

তাকে ফিরানোর জন্য আমার সাধ্যের সবটুকু চেষ্টা করে যখন নিরাশ হলাম, তখন আশ্রয় নিলাম আল্লাহর দরবারে। ছেলের সংশোধনের জন্য সালাত ও দুআ করতে লাগলাম।

রাতের শেষপ্রহরে দুআ কবুলের মুহূর্তগুলোর অপেক্ষায় থাকতাম। আল্লাহর নিকট দু-হাত তুলে দুআ করতাম, 'হে আল্লাহ, আমার চোখের মণি, আমার নয়নের মানিককে সালাতে দাঁড় করিয়ে দাও।'

এই দুআটি খুব বেশি বেশি করতাম, যেটি আল্লাহর নবি, পিতা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার বংশধরের জন্য করেছিলেন—

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝٤٠

হে আমার প্রতিপালক, আমাকে সালাত কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমার প্রতিপালক, আমার দুআ কবুল করে নিন।[১]

অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি করে, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করে, চোখের অশ্রু ছেড়ে দিয়ে, হৃদয়ের সবটুকু ইখলাস নিয়ে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুআ করতাম। আমার সন্তান জাহান্নামে পুড়বে—এই ভাবনায় আমার হৃদয় যেন দাউ দাউ করে জ্বলত।

দু-বছর পার হয়ে গেল। আমি একইভাবে আল্লাহর দরবারে দুআ চালিয়ে গেলাম। আমার হৃদয়ের দুঃখ, বেদনা সব আল্লাহকে জানাতাম। অবশেষে সেই দিন এলো, যেদিন ছেলেকে সালাতে দাঁড়াতে দেখে চক্ষু ও হৃদয় শীতল হলো আমার।

শুধু কি তা-ই? সে এখন রীতিমতো সালাতের নিষ্ঠাবান প্রচারকারী। সে মানুষকে সালাতের দিকে আহ্বান করে। সালাতের গুরুত্ব জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে, তাদেরকে সালাতে উদ্বুদ্ধ করে।

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মাথা নুয়ে আসে। আমি নিশ্চিত বিশ্বাস করি, তিনিই শ্রবণকারী; বান্দার ডাকে তিনিই সাড়া দেন। তিনিই সাড়া দেন বিপদগ্রস্ত ও

[১] সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৪০

অসহায় বান্দার মিনতিতে।

আমার ছেলের দ্বীনে ফেরার পথে সবচেয়ে বড় ও কার্যকরী অসিলা যেটা ছিল বলে আমার মনে হয়, সেটা হলো ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে, নাছোড়বান্দা হয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করা।[১]

[১] *তাজারুবুন লিল আ-বা ওয়াল উম্মাহাত ফি তাউইদিল আওলাদি আলাস সালাত*, পৃষ্ঠা : ১৩

সালাতের শীতল পরশে

‘হে বিলাল, সালাত কায়েম করো!’—কে বলেছেন এই উত্তম বাক্যটি?

এটি আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের বাণী।

আমরা কি দুনিয়ার পরিচয় জানি?

দুনিয়া হলো ছলনাময়ী, ধোঁকাবাজ; প্রতারক ও বহুরূপী। দেখলে মনে হয় শান্ত দাঁড়িয়ে আছে, বাস্তবে তা চলমান। দেখলে মনে হয় খুব সুবোধ, শিষ্ট ও শান্তিকামী, আদতে সে দাঙ্গাবাজ।[১]

দুনিয়া হলো বিপদ-আপদ, কষ্ট-ক্লেশ ও পরীক্ষার ঘর; দুঃখ-দুর্দশা, দুর্ভাগ্য ও বঞ্চনার ঠিকানা। এখানে দুঃখ-দুর্দশার কোনো শেষ নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন—

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝٤

নিশ্চয় আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে।[২]

[১] *আল-মুদহিশ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৯৭

[২] সুরা বালাদ, আয়াত : ৪

অর্থাৎ, মানুষ কষ্ট করে জীবনযাপন করে। কোনো না কোনো কষ্ট তার জীবনে লেগেই থাকে।

মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নেবার সাথে সাথেই ভোগ করতে হয় নাড়িকাটার যন্ত্রণা। এরপর তাকে কাপড় পরানো হয়, জামার ফিতা বেঁধে দেওয়া হয়। শিশুমন তখন সংকীর্ণতা ও অস্বস্তির কষ্ট অনুভব করে। দুধপানের কষ্ট; দুধপান বাধাগ্রস্ত হলে তো জীবন-প্রদীপটাই নিভে যাবে। এরপর সে জিহ্বা চালানো শুরু করে। তখন সবটুকু শক্তি ব্যয় করে শুরু হয় কথা বলার আপ্রাণ চেষ্টা। কিছু দিন যেতে না যেতেই দুধ ছাড়ানোর অসহনীয় যন্ত্রণা। ঐ সুন্দর মুখটিতে সজোরে আঘাত করলেও অতটা কষ্ট হবে না; যতটা কষ্ট দুধ ছাড়ানোতে হয়। মাতৃদুগ্ধের সুতীব্র তৃষ্ণা শিশুর কোমল হৃদয় যেন এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়।

একটু বয়স বাড়তে না বাড়তেই শুরু হয় দুঃখ-কষ্টের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শিক্ষকের ধমক, তর্জন, গর্জন। অভিভাবকের রুক্ষ শাসন। বড়দের রসকষহীন গুরু-গম্ভীর আদেশ-উপদেশ। সবকিছু মিলিয়ে জীবনটা যেন অস্থির হয়ে পড়ে।

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর কষ্ট-ক্লেশ ও চিন্তা-পেরেশানির নতুন নতুন দুয়ার খুলতে শুরু করে। যৌবনে বিয়ে-শাদি করে ঘর বাঁধার তাড়া। এর পরে কিছু দিনের মধ্যেই বাচ্চা-কাচ্চার জ্বালাতন। সাংসারিক ব্যস্ততা, জীর্ণ ঘরের মেরামত, নতুন ঘর নির্মাণ। শেষ দিকে বার্ধ্যক্যের আক্রমণ। হাত-পা অবশ, বিপদ-আপদ, আরো নানা ধরনের দুর্যোগে নুয়ে পড়া। মাথাব্যথা, দাঁত ও মাড়ির যন্ত্রণা, চোখ জ্বালাপোড়া, কানের বেদনা-সহ আরো কত কী! সেই সাথে ঋণ ও দেনা-পাওনা তো আছেই।

এতেই কি শেষ? একটি করে দিন অতিবাহিত হয় আর নতুন করে বিপদাপদ জেঁকে বসে। মারধর, জেল-জুলুম। যত দিন যায় ততই যেন নতুন ঝঞ্ঝাট গ্রাস করে আমাদের। তবু যদি শেষ হতো!

কিন্তু তা আর হয় না। এরপর দোরগোড়ায় কড়া নাড়ে মৃত্যু। আল্লাহর হুকুমে মৃত্যুর ফেরেশতা এসে ছিনিয়ে নেয় প্রাণ। কবরে এবার মুনকার-নাকিরের কড়া জিজ্ঞাসাবাদ। অন্ধকার কবরের ভয়ংকর ও বীভৎস সেই সময়। অসীম সে সময়! ফুরাতে চায় না যেন কিছুতেই। তারপর ফিরে যেতে হয় সমগ্র আরশ কুরসি ও মহাবিশ্বের অধিপতি আল্লাহর দরবারে। তাঁর সামনে নিজের সারা জীবনের কৃতকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব-নিকাশ। কত ভয়ংকর সেই দিন! কী শ্বাসরুদ্ধকর

পরিস্থিতি! এরপরই আসে অনন্তকালের জন্য নির্ধারিত আবাসস্থল। হয় জান্নাত, নতুবা জাহান্নাম! এজন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন—

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝٤

নিশ্চয় আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে।[১]

মানুষের হাতে যদি সবকিছুর ক্ষমতা থাকত, তাহলে সে কখনোই এত কষ্ট ভোগ করতে রাজি হতো না। এটা কীসের ইঙ্গিত বহন করে? নিশ্চয় এ সবকিছুই প্রমাণ করে এমন এক মহান সত্তার; যিনি এসব পরিচালনা করছেন এবং এই ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়েই সবার পরিণাম নির্ধারণ করে রেখেছেন।'[২]

বিভিন্ন ধরনের দুশ্চিন্তা আর সারাদিনের কষ্ট-ক্লেশের মাঝে দুনিয়া যেন জ্বলন্ত এক অগ্নিকুণ্ড। যা শুধু দিবানিশি অস্থিরতার আগুন জ্বালিয়ে রাখে। পুড়িয়ে কয়লা বানিয়ে ফেলে হৃদয় জগতের সবুজ বাগিচা। নির্জীব করে তোলে প্রাণের স্পন্দন। কিন্তু সালাত আর রবের ভালোবাসা এই অগ্নিকুণ্ডের মাঝে যেন এক সুশীতল পরশ। হৃদয়-বাগিচা সজীব হয়ে ওঠে সালাতের প্রশান্তিতে। তাতে ফোটে বাহারি রঙের ফুল। ছড়িয়ে দেয় মন-মাতানো ঘ্রাণ। দুঃখ-দুর্দশা আর কষ্ট-ক্লেশের সেই দুনিয়াই সালাতের স্পর্শে পরিণত হয় সাধ, আহ্লাদ ও সুখ উপভোগের জীবন্ত প্রতিচ্ছবিতে।

[১] সুরা বালাদ, আয়াত : ৪

[২] *আলজামি লি আহকামিল কুরআন*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ৬২